মুহাররমের শিক্ষা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সূচীনির্দেশিকা

বিষয় পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

মহররমের শিক্ষা

প্রতি বছর মহররমের সময় শিয়া–সুন্নী নির্বিশেষে কোটি কোটি মুসলমান হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনায় আন্তরিক দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ইমাম শুধু তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেই ক্ষান্ত হননি, ছোট ছোট কোলের শিশুদেরকেও কোরবান করছিলেন, এই সব ব্যাথা পীড়িতদের মধ্যে খুব কম লোকই সেদিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে। মজলুমের শাহদাত প্রাপ্তির পর তাঁর পরিজনবর্গ এবং তাঁদের সাথে প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিই দুঃখ প্রকাশ করবেন, এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এ দুঃখ ও বেদনা দুনিয়ার প্রতিটি গোত্র–বংশ এবং তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তিমাত্রই প্রকাশ করে থাকে। এর নৈতিক মূল্য খুবই সীমিত। কেননা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, এটি শাহাদাত লাভকারীর ব্যক্তিত্বের সাথে তার গোত্র–বংশ এবং আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার একটা স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, ইমাম হোসাইনের এমন কি বিশেষত্ব ছিল যার কারণে ১৩৪৫ বছর অতিবাহিত হবার পরও প্রতি বছর তাঁর জন্যে মুসলমানদের হৃদয় দুঃখভারা–ক্রান্ত হয়ে ওঠে? তাঁর শাহাদাতের পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না বলে যদি ধরেই নেয়া হয়, তাহলে কেবল ব্যক্তিগত মুহব্বত ও সম্পর্কের ভিত্তিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার কোনো কারণ বা অর্থ থাকতে পারে না। এবং স্বয়ং ইমামের দৃষ্টিতেও এই নিছক ব্যক্তিগত প্রীতির কতটুকুই বা মূল্য হতে পারে? তাঁর উদ্দেশ্যের চাইতে ব্যক্তিত্বকে যদি তিনি বড়ো মনে করতেন,

তাহলে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন কেন? তাঁর জীবন কোরবানী তো একথা প্রমাণ করে যে, উদ্দেশ্যকে তিনি ব্যক্তিত্বের উপর স্থান দিয়েছিলেন। তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যখন আমরা কিছু করলামনা, বরং তার বিপরীত কাজই করে যেতে থাকলাম, তখন নিছক তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যে শোক প্রকাশ এবং তাঁর হত্যাকারীদেরকে গালিগালাজ করে কিয়ামতের দিন আমরা ইমামের নিকট থেকে কোনো বাহ্‌বা লাভের ও আশা রাখতে পারিনা। উপরন্তু আমরা এও আশা করতে পারি না যে, তাঁর আল্লাহ্‌ও আমাদের এ কাজের কোনো মূল্য দিবেন।

শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্য

তাহলে এখন সেই উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইমাম হোসাইন (রাঃ) কি রাজ্য ও সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন এবং এজন্যেই কি তিনি জান কোরবান করে গেছেন? ইমাম হোসাইনের বংশের উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যক্তি কিছুমাত্র অবগত আছেন, তিনি কখনো এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারেননা যে,তাঁর মতো লোক ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব অর্জনের জন্যে কখনো মুসলমানের মধ্যে খুনখারাবী করতে পারেন। যারা মনে করে যে, তাঁর বংশ মুসলমানদের উপর রাজত্ব ও কর্তৃত্বের দাবীদার ছিল, কিছুক্ষণের জন্যে তাদের মতবাদ নির্ভুল বলে মেনে নিলেও হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস একথা প্রমাণ করবে যে, কর্তৃত্ব লাভের জন্যে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রক্তপাত ঘটনা কখনো তাঁদের নীতি ছিল না। কাজেই একথা মেনে নিতেই হবে যে, তৎকালে হযরত ইমাম হোসাইনের (রাঃ) দৃষ্টি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্রাণশক্তি এবং ব্যবস্থার মধ্যে কোনো বিরাট পরিবর্তনের পূর্বাভাস লক্ষ্য করছিল এবং এর গতিরোধের জন্যে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তাঁর নিকট অত্যধিক প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এমন কি এজন্যে প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়াকেও তিনি শুধু বৈধই নয়, অবশ্য করণীয় বা ফরয বলে মনে করতেন।

বিরাট পরিবর্তন

এই পরিবর্তন কি ছিল? বলাবাহুল্য, জনসাধারণ তাদের দীনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনেনি। শাসকগোষ্ঠী এবং জনসাধারণ সবাই আল্লাহ্, রসূল এবং কোরআনকে ঠিক সেই ভাবেই মানতেন যে ভাবে তারা এর আগে মেনে আসছিলেন। দেশের আইন ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়নি। বনি উমাইয়ার শাসনামলে কোরআন এবং সুন্নাহ্ ভিত্তিক সমস্ত ব্যাপারের ফয়সালা হচ্ছিল, যেমন তাদের কর্তৃত্ব লাভের পূর্ব থেকে হয়ে আসছিল। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে দুনিয়ার কোনো মুসলিম রাষ্ট্রেও আইন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অনেকে ইয়াযিদের ব্যক্তিগত ভূমিকাকে খুব স্পষ্ট এবং জোরালো ভংগিতে পেশ করে থাকেন, যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে এ ভুল ধারণার প্রসার লাভ করেছে যে, ইমাম যে পরিবর্তনের গতি রোধ করতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তা শুধু এই ছিল যে, একজন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন।কিন্তু ইয়াযিদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের যে নিকৃষ্টতর ধারণা পেশ করা যেতে পারে তার সবটুকু হুবহু মেনে নেবার পরও একথা স্বীকার্য নয়যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি নির্ভুল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে নিছক কোনো দুশ্চরিত্র ব্যক্তির শাসন ক্ষমতা দখল এমন কোনো ভীতিপ্রদ ব্যাপার ছিল না, যার ফলে ইমাম হোসাইনের (রাঃ) মতো বিচক্ষণ এবং শরীয়তে গভীর অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি বেসবর হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই এই ব্যক্তিগত ব্যাপারকে সেই আসল পরিবর্তন বলা যেতে পারে না, যে জন্যে ইমাম অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। গভীরভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণের পর যে কথা আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তাহলে এইঃ ইয়াযিদের যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠা, তারপর সিংহাসনারোহণের ফলে আসলে যে ত্রুটির সূচনা হচ্ছিল, তা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, তার প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন। এ

পরিবর্তনের ফলাফল যদিও তখন পুরোপুরি পরিস্ফুট হয়নি, তবুও কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি গাড়ীর দিক পরিবর্তন দেখেই একথা অনুভব করতে পারেন যে, এবার তার পথ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং যে পথে এখন সে অগ্রসর হচ্ছে তা শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যাবে। ইমাম হোসাইন (রাঃ) এই দিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেই গাড়ীকে তার সঠিক লাইনে পরিচালিত করার জন্যে নিজের জান কোরবান করে দেবার ফয়সালা করলেন।

কথাটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের দেখা উচিত যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিশেষত্ব কি ছিল? এবং উত্তরাধিকারসূত্রে ইয়াযিদের কর্তৃত্ব দখলের পর মুসলমানদের মধ্যে যে রাষ্ট্রব্যবস্থার সূত্রপাত হলো তার ফলে বনি উমাইয়া এবং বনি আব্বাসদের শাসনকালে কি বিশেষ উপসর্গের প্রকাশ ঘটলো? এই তুলনামূলক আলোচনার পর আমরা একথা অবগত হবো যে, গাড়ী পূর্বে কোন লাইনে অগ্রসর হচ্ছিল এবং দিক পরিবর্তনের পর কোন লাইনে অগ্রসর হচ্ছিল এবং দিক পরিবর্তনের পর সে কোন লাইনে চলতে শুরু করেছে। এ ছাড়াও আমরা বুঝতে পারবো যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) যাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের উন্নত পরিবেশে যার শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিলো, তিনি কেন এই দিক পরিবর্তনের মুখে পৌছেই এই নতুন লাইনে গাড়ীর অগ্রগতি রোধের জন্যে পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং কেনই বা তিনি এই তীব্র দ্রুতগামী গাড়ীর গতি রোধ করে তাকে স্পষ্ট ও নির্ভুল পথে পরিচালনার দরুণ যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হবে তার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও এই দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সেখানে শুধু একথা মুখেই উচ্চারণ করা হতো না, বরং মনে প্রাণে মেনে নেয়া হতো এবং কর্মের মাধ্যমে এই আকিদা ও বিশ্বাসের পূর্ণ প্রমাণ পেশ করা হতো যে, দেশের মালিক আল্লাহ, জনসাধারণ আল্লাহর প্রজা এবং এই প্রজাপালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্র জনসাধারণের মালিক নয় এবং জনসাধারণও রাষ্ট্রের গোলাম নয়। রাষ্ট্র প্রধানদের কাজ হলো সর্বপ্রথম আল্লাহর বন্দেগী এবং দাসত্বের শৃংখল গলায় ঝুলিয়ে নেয়া। অতঃপর আল্লাহর প্রজাদের উপর আল্লাহী আইন জারি করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মুয়াবিয়া ইয়াযিদের উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন দখলের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে মানুষের কর্তৃত্ব ভিত্তিক রাজতন্ত্রের সূচনা হলো, তাতে আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যের ধারণা কেবল মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো। মানবীয় রাজতন্ত্রের গতানুগতিক আদর্শকেই সে কার্যতঃ গ্রহণ করে নিয়েছিল। অর্থাৎ দেশ বাদশাহ এবং শাহী খান্দানের এবং তারাই দেশবাসীর ধন-সম্পদ ইজ্জত-আবরু সমস্ত কিছুর মালিক। এদেশে আল্লাহর আইন যদিও কখনো প্রচলিত হয়ে থাকে, তাহলে তা হয়েছে শুধু জনসাধারণের মধ্যে। বাদশাহ, তাঁর খান্দান, আমীর উমরাহ এবং কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর আওতা বহির্ভূতই থেকে গেছে।

উদ্দেশ্যের পরিবর্তন

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর পৃথিবীতে তাঁরই পছন্দের সৎবৃত্তিগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার আর অসৎবৃত্তিগুলোর পথরোধ এবং বিলুপ্তি সাধন। কিন্তু মানবীয় কর্তৃত্ব ভিত্তিক রাজতন্ত্র চালু করার পর রাজ্য জয়, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, কর উসূল এবং বিলাসী জীবন যাপন করা ছাড়া রাষ্ট্রের অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকলোনা। বাদশাহদের মধ্যে কালভদ্রে হয়তো কেউ আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার কাজে লিপ্ত হয়েছেন। বাদশাহ এবং তাদের সভাসদ, আমীর-উমরাহ এবং অধীনস্থ শাসকমণ্ডলীর মাধ্যমে সৎকাজের প্রসার খুব কম এবং অসৎকাজের প্রসার খুব বেশী হয়েছে। সৎকাজের প্রতিষ্ঠা ও অসৎকাজের প্রতিরোধ এবং দীনের প্রচার-প্রসার ও ইসলামী জ্ঞান গবেষণা ও সংকলনের ব্যাপারে যারা কাজ করে গেছেন, সরকারী সাহায্য তো দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রনায়কদের রোষানলে পতিত হয়েছেন এবং সবধরনের বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও তারা নিজেদের কাজ করে গেছেন। তবুও তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে রাষ্ট্র, শাসক সমাজ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনধারা এবং নীতি-প্রকৃতির প্রভাবে মুসলিম সমাজ ধাপেধাপে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এমন কি এই শাসকগোষ্ঠি নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ইসলাম প্রচারের পথে বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বনি উমাইয়াদের শাসন কালে নও মুসলিমদের উপর জিজিয়াকর ধার্য এর জঘন্যতম প্রকাশ।

প্রাণশক্তির পরিবর্তন

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি ছিল তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি। রাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যেই হতো এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। রাষ্ট্রের সকল কর্মচারী, বিচারপতি এবং সেনাপতিগণ এই রুহানী শক্তিতে ভরপুর হতেন। অতঃপর সমগ্র সমাজে তারা এই প্রাণশক্তির বন্যা প্রবাহিত করতেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের পথে পা রাখার সাথে সাথেই মুসলমানদের রাষ্ট্র এবং শাসক সমাজ রোমের কাইসার ও ইরাণের কিসরার রীতিনীতি এবং চাল চলন অনুকরণ করলো। ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম ও নিপীড়ন, আল্লাহ্ ভীতির পরিবর্তে উচ্ছৃংখলতা, চরিত্রহীনতা, গান–বাজনা এবং বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হলো। শাসক সমাজের চরিত্র ও কার্যাবলীতে হারাম ও হালালের কোনো পার্থক্য থাকলোনা। রাজনীতির সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েই গেলো। আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে এই শাসক সমাজ বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো। মানুষের ঈমান ও বিবেককে জাগ্রত করার পরিবর্তে বখশিশের লোভ দেখিয়ে তার সওদা শুরু হয়ে গেলো।

এ ছিল অভ্যন্তরিণ পরিবর্তন। ইসলামী শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদী নীতির মধ্যেও এই পরিবর্তন সূচিত হলো। এই শাসনতন্ত্রের সাতটি ধারা ছিল, তাদের প্রত্যেকটিই পরিবর্তিত হয়েছে।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রথম ধারা

জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এই ছিল ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। সেখানে কোনো ব্যক্তি স্বকীয় প্রচেষ্টায় কর্তৃত্ব অর্জন করেনা। বরং জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করে নিজেদের মধ্য থেকে উৎকৃষ্টতর ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব অর্পন করে। আনুগত্য প্রকাশ যেন কর্তৃত্ব লাভের পরিণতি না হয়, বরং হয় তার কারণ। স্বীয় প্রচেষ্টা অথবা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কেউ জনসাধারণের আনুগত্য হাসিল করতে পারে না। আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে তারা হয় সম্পূর্ণ স্বাধীন। জনগণের আনুগত্যের ভোট অর্জন না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারে না। আবার জনগণের আস্থা লাভে বঞ্চিত হবার পর সে জবরদস্তি ক্ষমতা দখল করে থাকতে পারে না। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেকেই এই নীতি অনুযায়ী কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। আমীর মুয়াবিয়ার (রাঃ) ব্যাপারে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। এজন্যে সাহাবার বিপুল মর্যাদা সত্বেও তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করা হয়নি। কিন্তু অবশেষে ইয়াযিদের উত্তরধিকার সূত্রে ক্ষমতা দখলের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের ফলে এ নিয়ম নীতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে শাহী তখ্‌ত দখল করার যে কুপ্রথা শুরু হয়, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা দ্বিতীয়বার নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি। পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসকরা মুসলমানদের স্বাধীন মতামত গ্রহণের পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগে কর্তৃত্ব হাসিল করেছে। মুসলমানদের আনুগত্যের ভোট গ্রহণ করে শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরিবর্তে তারা শাসন ক্ষমতা দখল করে মুসলমানদের আনুগত্যের ভোট অর্জন করেছে। আনুগত্যের প্রকাশের ব্যাপারে জনগণের স্বাধীন মতামতের আর কোনো অবকাশ ছিল না। শাসন–ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে আনুগত্যের ভোট করা আর কোনো শর্তের মধ্যে গণ্য হতো না।

শাসন-ক্ষমতা যার হাতে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বিরত থাকার শক্তিই জনগণের ছিল না, তা সত্বেও যদি তারা আনুগত্য প্রকাশ না করতো, তাহলেও শাসনক্ষমতা দখলকারী ক্ষমতাচ্যুত হতো না। আব্বাসী শাহানশাহ মনসূরের শাসন আমলে এই জবরদস্তি আনুগত্য গ্রহণের রীতিকে খতম করার জন্যে ইমাম মালিক (রাঃ) যখন প্রচেষ্টা শুরু করেন, তখন বেত্রাঘাতে তাঁর শরীর-পিঠ জর্জরিত হয় এবং অবশেষে তাঁর কাঁধ থেকে একটি হাত উপড়িয়ে ফেলা হয়।

দ্বিতীয় ধারা

এই শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল ঃ রাষ্ট্রপরিচালিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে এবং পরামর্শও করতে হবে তাদের সাথে যাদের ইলম, তাক্ওয়া এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার মতো বুদ্ধিবৃত্তির উপর জনসাধারণ আস্থা রাখে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যাঁরা শুরা'র (পার্লামেণ্ট) সদস্য ছিলেন, যদিও সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদেরকে নির্বাচিত করা হয়নি, বর্তমান যুগের বিচারে তাঁদেরকে মনোনয়ন দান করা হয়েছিল বলতে হবে, কিন্তু তাঁরা জ্বী-হুজুরের দল অথবা নিছক খলিফার স্বার্থ সংরক্ষণের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন বলে তাঁদেরকে উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়েছিল, একথা নয়, বরং পূর্ণ নিষ্ঠা, এবং নিঃস্বার্থ মনোভাব নিয়ে তাঁরা জাতির সর্বোত্তম ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করেছিলেন। খলীফাগণ তাঁদের মুখ থেকে হক ছাড়া অন্য কিছু আশা করতেন না। তাঁদের সম্পর্কে আশা ছিল যে, তাঁরা প্রত্যেক ব্যাপারে ঈমানদারীর সাথে নিজেদের বিবেক এবং জ্ঞান অনুযায়ী যথাসম্ভব নির্ভুল মতামত পেশ করবেন। কোনো ব্যক্তিও বিশ্বাস করতে পারতো না যে, রাষ্ট্রকে তাঁরা ভুল পথে পরিচালিত হতে দেবেন। সেযুগে যদি বর্তমান পদ্ধতিতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে মুসলিম জনগণ তাদেরকে আস্থাভোট প্রদান করতেন। কিন্তু রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হবার সাথে সাথে মজলিসে শুরার এ পদ্ধতি পরিবর্তিত হলো। এখন বাদশাহ জুলুম-জবরদস্তি এবং সর্বময়

কর্তৃত্ব–ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে লাগলেন। শাহাজাদা, তোষামোদকারী সভাসদ, প্রাদেশিক গভর্ণর, সেনাপতিগণ ছিলেন তাদের পরিষদের সদস্য। উপদেষ্টাগণ এমন পর্যায়ের লোক ছিলেন যে, তাদের ব্যাপারে যদি জনগণের মতামত গ্রহণ করা হতো, তাহলে একটি আস্থা ভোটের পরিবর্তে তারা লাভ করতেন হাজারটি অভিশাপের ভোট। অন্যদিকে সমগ্র জাতি যেসব সত্যপূজারী সত্যবাদী, মহাজ্ঞানী এবং আল্লাহভীরু লোকের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলো, বাদশাহদের দৃষ্টিতে তারা কোনো প্রকার আস্থা লাভের যোগ্যতা রাখতেন না। বরং তারাই ছিলো লাঞ্ছিত অথবা কমপক্ষে সন্দেহযুক্ত।

তৃতীয় ধারা

এর তৃতীয় ধারা ছিল ঃ স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে জনসাধারণকে পূর্ণ সুযোগ দান। ইসলাম সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের প্রতিরোধকে শুধু প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার নয়, তার কর্তব্য বলেও ঘোষণা করেছে। ইসলামের সমাজ এবং রাষ্ট্রের নির্ভুল পথ পরিক্রমা নির্ভর করতো জনগণের কন্ঠ এবং বিবেকের স্বাধীনতার উপর, মহাপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের প্রত্যেকটি ক্রটির বিরুদ্ধে তারা সমালোচনা করতে পারতো এবং হককথা প্রকাশ্যে বলতে পরতো। খেলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শুধু জনগণের এই অধিকারই পুরোপুরি সংরক্ষিত ছিল না, বরং তারা এটিকে তাদের উপর অর্জিত এক মহান দায়িত্ব বলে মনে করতেন এবং এই অধিকার আদায় করে নেবার ব্যাপারে তাঁরা জনগণকে উৎসাহিতও করতেন। তাঁদের মজলিসে শুরার সদস্যগণই শুধু নয়, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই বলার, সমালোচনার এবং যে কোনো সময়ে খলিফার নিকট কৈফিয়ত তলব করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আর এই স্বাধীনতার পূর্ণ ব্যবহারের কারণে তাদেরকে কখনো হুমকীর সম্মুখীন হতে হয়নি, ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি, বরং এজন্যে তারা সর্বদা প্রশংসা ও বাহবা লাভ করেছে। জনগণের এই সমালোচনার স্বাধীনতা খলীফাদের দান ছিল

না এবং এজন্যে তাঁরা জনগণকে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকতেও বলতেন না। ইসলামী শাসনতন্ত্রই তাদেরকে এ অধিকার দান করেছিল। আর খলিফাগণ এর সম্মান রক্ষা করা নিজেদের কর্তব্য মনে করতেন। সৎকাজের জন্যে এর ব্যবহার প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহ্ এবং রাসূল নির্ধারিত ফরয ছিল এবং এই ফরয প্রতিপালনের জন্যে অনুকূল সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাকে স্থায়ী রাখা খলীফাগণ নিজেরদের কর্তব্য মনে করতেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হবার সাথে সাথেই মানুষের বিবেক তালাবদ্ধ করে দেয়া হলো, কণ্ঠ দাবিয়ে দেয়া হলো। পরিবেশ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছাল যে, মুখ খুললেই প্রশংসা করতে হবে, অন্যথায় নীরব থাকতে হবে। অথবা স্পষ্টবাদীতাই যার স্বভাব এবং স্বভাবকে পরিবর্তিত করতে তার বিবেক নারাজ, তাকে যন্ত্রনা ভোগ অথবা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই নীতির ফলে মুসলমানের মধ্যে ধীরে ধীরে হতাশা, দুর্বলতা এবং সুযোগসন্ধানীর মনোবৃত্তির প্রসার হতে লাগলো। বিপদকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে সত্য কথা জোরালো ভাষায় বলার মতো লোকের সংখ্যা দিন দিন কমে আসতে লাগলো। তোষামোদ এবং চাটুকারীতার মূল্য বেড়ে গেলো এবং সত্যপূজারী ও স্পষ্টবাদীতার মূল্য কমে গেলো। উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ঈমানদার মুক্তবুদ্ধির লোকেরা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, শাহী খান্দানগুলোর দায়িত্বের স্থায়ীত্বের ব্যাপারে তাদের অন্তর ঔদাসীন্যে ভরে গেলো। এক খান্দানকে অপসারিত করে যখন অন্য খান্দান শাহী মসনদ দখন করতো, তখন পূর্ববর্তী খান্দানের অনুকুলে তারা টু শব্দটিও করতো না। অতঃপর কোনো হতভাগ্য যখন পিছলিয়ে পড়তো, তখন তারা গর্দানে জোরে এক পদাঘাত করে তারা তাকে আরো গভীর আবর্তে ঠেলে দিতো। ক্ষমতার হাত বদল হচ্ছিল, একটার পর একটা বংশের আগমন আর প্রত্যাগমণ চলছিলো কিন্তু জনসাধারণ এই দৃশ্য শুধু অবলোকনই করছিলো, দর্শকের স্থান থেকে তারা একটুও অগ্রসর হয়নি।

চতুর্থ ধারা

এই শাসনতন্ত্রের চতুর্থ ধারাটি ছিল তৃতীয় ধারাটির সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। সেটি হলো এই ঃ খলীফা এবং তাঁর রাষ্ট্রকে আল্লাহর এবং জনগণ উভয়ের নিকট জবাবদিহী করতে হবে। একদিকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহীর গভীর অনুভূতি খোলাফায়ে রাশেদীনের দিবসের শান্তি এবং রাত্রের আরাম–আয়েশ হারাম করে দিয়েছিলো। অন্যদিকে জনসমাজের সম্মুখে জবাবদিহীর ব্যাপারে বলা যায় যে, তাঁরা সব সময় সকল স্থানে নিজেদেরকে জনগণের নিকট জবাব দান করতে হবে বলে প্রস্তুত রাখতেন। তাঁদের সরকারের এ নীতি ছিল না যে, কেবল মজলিসে শুরায় (পার্লামেন্টে) নোটিশ দিয়েই তবে তাদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে বরং প্রতিদিন পাঁচবার নামাযের জামাতে তাঁরা জনগণের মুখোমুখি হতেন। প্রতি সপ্তাহে জুমার নামাযে তাঁরা জনগণের সম্মুখে নিজেদের পেশ করতেন এবং তাঁদের কথা শুনতেন। তাঁরা কোনো দেহরক্ষী ছাড়াই হাটে–বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের রাস্তা পরিষ্কার করে দেবার জন্যে কোনো পুলিশ বাহিনীও সংগে থাকতো না। তাঁদের গর্ভমেন্ট হাউসের (অর্থাৎ তাঁদের কাঁচা বাড়ী) দরজা সবার জন্য উম্মুক্ত ছিল, যে কেউ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতেন।

যে কোনো সময় যে কোনো ব্যক্তি তাদের নিকট প্রশ্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর চাইতে পারত। এ উত্তরদানের বিষয়টি মোটেই সীমিত ছিল না। সব সময় এবং প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে দেয়া হতো–কোনো প্রতিনিধির মারফতে নয়, সরাসরি সমগ্র জাতির মম্মুখে। জনগণের সমর্থনে তারা ক্ষমতার আসনে বসেছিলেন এবং জনগণই আবার তাঁদেরকে সে আসন থেকে অপসারিত করে অন্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করতে পারতো। এজন্যে সাধারণের মুখোমুখি হতে তাঁরা মোটেই ভয় পেতেন না এবং ক্ষমতা থেকে বেদখল হওয়া তাদের দৃষ্টিতে কোনো বিপর্যয়ের সূচনা

বলে বিবেচিত হতো না। তাই তারা এথেকে নিষ্কৃতি লাভের কথা চিন্তাই করতেন না। কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রচলনের সাথে সাথেই এই জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটলো। আল্লাহর সম্মুখে জাবাদিহীর ধারণা হয়তো কথার মাধ্যমে ফুটে উঠতে পারে কিন্তু সমগ্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার চিহ্ন খুব সামান্যই চোখে পড়বে! থাকলো জনগণের সম্মুখে জবাব দান, বলা বাহুল্য কার এতো বড়ো বুকের পাটা যে, তাদের কাছে থেকে জবাব তলব করতে পারে। তারা জাতির উপর বিজয় লাভ করেছিল। বিজিতদের সামনে বিজয়ীদের নিকট থেকে কে জবাব তলব করতে পারে? তারা শক্তি প্রয়োগ করে কর্তৃত্ব লাভ করেছিল। তাদের শ্লোগান ছিল, যার কোমরে শক্তি আছে সে আমাদের নিকট থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিক। এ ধরণের লোকেরা কি কখনো জনগণের মুখামুখি হয় এবং জনসাধারণই বা তাদের ধারে কাছে কেমন করে ঘেঁষতে পারে? তারা রহীম–করিমের সঙ্গে মহল্লার মসজিদে এসে নামাজ পড়তো না, পড়তো তাদের শাহী মহলের সুরক্ষিত মসজিদের মধ্যে। অথবা বাইরে তাদের একান্ত নির্ভরযোগ্য দেহরক্ষী সৈন্য দলের কঠোর প্রহরাধীনে। তারা যখন ঘোড়া অথবা হাতীর পিঠে বাইরে বেরুতো, তখন তাদের অগ্র–পশ্চাত সশস্ত্র বাহিনী থাকতো। জনসাধারণের সাথে কখনো তাদের মুখোমুখি হতে হতো না।

পঞ্চম ধারা

ইসলামী শাসনতন্ত্রের পঞ্চম ধারা ছিল ঃ বায়তুলমাল আল্লাহর সম্পত্তি এবং মুসলমানদের আমানত। আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ দিয়ে জিনিস তার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত নয় এবং আল্লাহর পথ ছাড়া অন্য পথে ব্যয়িত হওয়াও উচিত নয়। কোরআনের দৃষ্টিতে এতিমের সম্পত্তিতে তার অভিভাবকের অধিকার যতোটুকু বায়তুল মালের সম্পত্তিতে খলীফাদের অধিকারও ততোটু

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ - النساء - ٦

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি স্বচ্ছল সে যেন (এতিমের মাল থেকে) নিবৃত্ত থাকে। আর যে অসচ্ছল সে যেন তাতোটাই পারিশ্রমিক গ্রহণ করে যা ন্যায় সঙ্গত।

খলীফাকে বায়তুল মালের আয়–ব্যয়ের ব্যাপারে এক এক পয়সার হিসেব দিতে হবে এবং জনসাধারণ তাঁর থেকে হিসেব তলব করার পূর্ণ অধিকার রাখে। খোলাফায়ে রাশেদীন এ নীতিকেও পরিপূর্ণ দায়িত্ব সত্যানুরাগীতার সাথে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। তাঁদের কোষাগারে শরীয়তের নির্দ্ধারিত পন্থায় অর্থাগম হতো এবং তাঁর নির্দেশিত পথেই তা ব্যয়িত হতো। তাঁদের মধ্যে যারা বিত্তবান ছিলেন তারা এক পয়সাও পারিশ্রমিক না নিয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এমন কি তাদের কেউ কেউ নিজের পকেট থেকে জাতির জন্যে অর্থব্যয়ও করেছেন। আর বিনা বেতনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সামর্থ যাদের ছিলনা, তাঁরা এই দিবারাত্র পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহের জন্যে যে ভাতা গ্রহণ করতেন, তার পরিমাণ এতোই স্বল্প ছিল যে, যে কোনো নিষ্ঠাবান ব্যক্তিই

তাদের ন্যায়সংগত পারিশ্রমিকের চাইতে কমই বলবেন। তাঁদের শত্রুরাও এই পরিমাণকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলতে সাহস করতো না। এ ছাড়া বায়তুলমালের আয়-ব্যয়ের হিসেবে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় তাঁদের কাছ থেকে চাইতে পারতো এবং তাঁরাও যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো সময় উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক বিরাট মজলিসে একজন সাধারণ লোকও খলীফাকে জিজ্ঞেসা করতে পররতো যে, বায়তুলমালে ইয়ামান থেকে যে চাদর এসেছে তা দৈর্ঘ-প্রস্থেতো এতোখানী নয় যে তা দিয়ে আপনি এতো লম্বা জামা তৈরী করতে পারেন, এই অতিরিক্ত কাপড় আপনি কোথায় পেলেন? কিন্তু যখন খেলাফত রাজতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করলো তখন বায়তুলমাল আর আল্লাহ এবং মুসলমানের অধিকারে থাকলো না, তা হলো বাদশাহর সম্পত্তি। সম্ভাব্য সকল বৈধ ও অবৈধ উপায়ে তাতে অর্থগম হতে লাগলো এবং বৈধ ও অবৈধ উভয় পথেই তা ব্যয়িত হতে লাগলো। তাদের কাছ থেকে এর হিসেব তলব করার সাহস কারুর ছিলনা। গোটা দেশটাই ছিল যেন একটা লা-ওয়ারিশ সম্পত্তি। আর একজন ডাকপিয়ন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সরকারের সকল কর্মচারী যে যার সুযোগ মতো তার মধ্যে হাত সাফাই করেছিলো। এ ধারণাই তাদের মন থেকে উঠে গিয়েছিল যে, ক্ষমতা লাভ এমন কোনো পরোয়ানা নয় যার ফলে বেপরোয়া লুটতরাজ তাদের জন্যে হালাল হয়ে যাবে। আর জনগণের সম্পত্তি মাতৃদুগ্ধ নয় যে তাকে তারা বেমালুম হজম করতে থাকবে, এ ব্যাপরে কারুর সম্মুখে জবাবদিহী করতে হবে না।

ষষ্ঠ ধারা

ষষ্ঠ ধারা ছিল এই যে ঃ দেশে আইনের (আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন) শাসন হবে। কারুর সত্তা আইনের উর্ধে থাকবে না। আইনের সীমা পেরিয়ে বাইরে এসে কাজ করার অধিকার কারুর থাকবে না। একজন সাধারণ লোক থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সবার উপর একই আইনের অবাধ শাসন চলবে। ন্যায়বিচারের ব্যাপারে কারুর প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণ প্রদর্শন করা হবে না। ন্যায় বিচার করার ব্যাপারে আদালতগুলোকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়া হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন এই নীতি অনুসৃতির সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা পেশ করেছিলেন। বাদশাহর তুলনায় অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা আল্লাহ্র আইনের শৃংখলামুক্ত হননি। তাঁদের বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা আইনের সীমা পেরীয়ে কারুর উপকার করতে পারেনি এবং তাদের অসন্তুষ্টি আইনের বিরুদ্ধে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। জনসাধারণের মধ্য থেকে কেউ যদি তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতো, তাহলে একজন সাধারণ মানুষের মতোই তাঁরা আদালতে শরনাপন্ন হতেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কারুর কোনো অভিযোগ থাকলে কাজীর নিকট ফরিয়াদ করে তাঁদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় হাযির করানো যেতো। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক গভর্ণর ও সেনাপতিগণকেও তাঁরা আইনের শৃংখলে আটকিয়ে রেখেছিলেন। আদালতের কার্যে কাজীর উপর প্রভাব বিস্তার করার অধিকার কারুর ছিল না। আইনের সীমা পেরিয়ে বিচার মুক্ত হবার ক্ষমতা কারুর ছিলনা। কিন্তু খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রে পদার্পন করার সাথে সাথেই এই নীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। অতঃপর শুধু বাদশাহ্, শাহ্জাদা, আমীর-উমরাহ্, শাসনকর্তা এবং সেনাপতি নয়, শাহী মহলের গোলামবাদীরা পর্যন্ত আইনের উর্ধে উঠে গেলো। জনগণের অর্থ-সম্পত্তি, ইজ্জত, অব্রু গর্দান পর্যন্ত তাদের জন্যে হালাল হয়ে গেলা। ইনসাফের মানদন্ড হলো দুটো। একটা দুর্বলের জন্যে, আরেকটা শক্তিমানের। আদালতের উপর শক্তি প্রয়োগ করা হলো। ন্যায় বিচারক কাজীদের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠলো।

এমন কি আল্লাহ্ ভীরু ফকীহগণ কাজীর পদ গ্রহণ করার তুলনায় বেত্রাঘাত এবং জেলখানার শাস্তিবরণকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। জুলুম ও নির্যাতনকে এড়িয়ে আল্লাহর আযাব ভোগ করাকে তারা পসন্দ করলেন না।

সপ্তম ধারা

অধিকার এবং মর্যাদার দিক দিয়ে পূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা ইসলামী শাসনতন্ত্রের সপ্তম ধারা ছিল। প্রারম্ভিক ইমলামী রাষ্ট্রে এই নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে দেশ, গোত্র, ভাষা প্রভৃতির পার্থক্য ছিল না। গোত্র এবং বংশের দিক দিয়ে কেউ কারুর চাইতে শ্রেষ্টতম মর্যাদার অধিকারী ছিল না। আল্লাহ্ এবং রাসূলের অনুগতদের অধিকার ও মর্যাদা ছিল সমান। একজন অন্য জনের চাইতে শ্রেষ্ঠ হতেন শুধু চরিত্র, নৈতিকতা যোগ্যতা এবং জনসেবার কারণে। কিন্তু খেলাফত যখন রাজতন্ত্রের রূপধারণ করলো, তখন সংকীর্ণ বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো সকল দিক থেকে। শাহী খান্দান এবং তাদের পরিষদের মর্যাদা সব চাইতে বৃদ্ধি পেলো। অন্যান্য বংশের তুলনায় তাদের বংশ অধিকতর অধিকার ও মর্যাদা লাভ করলো। আরবী আজমী বিদ্বেষ জাগ্রত হলো এবং স্বার্থপর আরবদের মধ্যে বংশে বংশে ঘরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও সংঘর্ষের বীজ দানা বেঁধে উঠলো। এ জিনিষটা ইসলামী সমাজের বিপুল ক্ষতি সাধন করেছে। ইতিহাসই এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

শাহাদাতের সার্থকতা

ইসলামী খিলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করার ফলে এই পরিবর্তনগুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটলো। ইয়াযিদের উত্তারাধিকার সূত্রে সিংহাসন দখলের ফলে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে ঐতিহাসিক সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আবার একথাও অনস্বীকার্য যে, পরিবর্তনের এই প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর অল্প দিনের মধ্যেই রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে উপরোল্লিখিত দুর্নীতিগুলো আত্মপ্রকাশ

করেছিল। এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণের সময় যদিও এ দুর্নীতিগুলো পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেনি। তুবও বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই এর পরিণাম অনুভব করতে পারতেন। একথা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন ছিল না যে, এই পরিবর্তনের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলাম যে পরিবর্তন সাধন করেছিল তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্যেই হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি ফয়সালা করলেন, একটা শক্তিশালি রাষ্ট্রের বিরোধীতা করার যে ভয়ঙ্কর পরিণাম হতে পারে তার সবটুকু বিপদ হাসিমুখে গ্রহণ করেও তাঁকে এই বিপ্লবের প্রতিরোধ করতে হবে। তাঁর প্রচেষ্টার পরিণতি কারুর অজানা নেই। কিন্তু এই বিপদসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর বীরের মতো এর সমগ্র পরিণতিকে গ্রহণ করে নিয়ে ইমাম যে কথা প্রমাণ করে গেছেন তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতিগুলোর সংরক্ষণের জন্যে মুমিন যদি তার জান কুরবান করে দেয়, তার আত্মীয় পরিজনকে কোরবানী করে, তাহলেও তার উদ্দেশ্যের তুলনায় একস্তু নেহায়েত কম মূল্যই রাখে। আর এই নীতিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত সাতটি পরিবর্তন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কেউ হয়তো তাচ্ছিল্ল ভরে একে নিছক একটা রাজনৈতিক কার্য বলতে পারে, কিন্তু হোসাইন ইবেন আলীর দৃষ্টিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটি ছিল একটি দীনি কর্তব্য। এজন্যে শাহাদাতের জযবা নিয়েই তিনি একার্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

সমাপ্ত